শেখ মুজিবঃ নক্ষত্রের উত্থান পতন

সুমন তুরহান

মাঠের চাষা, যার স্বপ্নে ছিলো সোনার গুচ্ছের মতো ধান, যে নিয়ত নিয়োজিত ছিলো পলিমাটির আরাধনায়, সেও শুনতে পেয়েছিলো সেই ডাক; সে সাড়া দিয়েছিলো। আদমজীর শ্রমিক, যে রক্তমাংসময় লিপ্ত ছিলো কলকব্জার সাথে দিনরাত, তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে কম্পন তুলেছিলো সেই আহ্বান;- সে সাড়া দিয়েছিলো। চৌরাস্তার শ্রান্ত রিকশাচালক, যে স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে দ্বন্দ্বরত ছিলো তার রঙিন রিকশার সাথে, সেও ঘুমের মধ্যে তড়িৎ লাফিয়ে উঠেছিলো হঠাৎ ভেসে আসা তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে- তাদের সবার আদিগন্ত আশ্চর্য রাইফেল অকস্মাৎ অন্ধকারের হিংস্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলো, ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলো শত্রুপক্ষকে। যে সংক্রামক, অথচ স্বয়ংক্রিয় প্রেরণা পাগল করে তুলেছিলো তাদের শরীরের প্রতিটি রক্তক্ষরিত শিরা উপশিরা, প্রস্তুত করে তুলেছিলো বুকে পেতে নিতে অজস্র ঘাতক ইস্পাত ও বারুদ;- সেই প্রেরণাটির নাম শেখ মুজিব, বাংলাদেশের মহাস্থপতি।

নিরর্থক, অর্থবিরহিত, শুন্যগর্ভ স্তবস্তুতিতে বাঙালি অদ্বিতীয়; বাঙালি জাতিগতভাবেই স্তাবক। যতো বিশেষন আমরা রাষ্ট্রনায়কদের আগে পরে দিই, তার কেবল তুলনা করা চলে দেবতার বিশেষনের সাথে। মুজিবের জয়গান গেয়ে কবিতা লিখেছেন অনেকে, বক্তৃতায় মুখর হয়েছেন তাঁর স্তবে; 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা', 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' - জপতে জপতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। মুজিব নিজে নষ্ট ছিলেন না, কিন্তু এই স্তবগুলো তাঁকে নষ্ট করেছিলো পরে।মুজিবকে দেবতার মতো ৯৯ টি অভিধা দেয়ার প্রয়োজন নেই, মুজিব দেবতা নন। বঙ্গীয় ব-দ্বীপে স্তাবকতা প্রায়শই নিতে পারে চরম রূপ; বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়ে একই শ্লোক আমরা পুনরাবৃত্তি করে যাই শতাব্দীর পর শতাব্দী; ভাবমুর্তিপুজায় আমরা অনেকটা অন্ধ পৌত্তলিকের মতো। মুজিব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নন, তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বাঙলি রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-মধুসুদন; তবে বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে মুজিব অদ্বিতীয়, তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই। তবে মুজিবের মহিমা শুধু স্তাবকদের স্তুতিস্বর্বস্ব নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে একাত্তরের অটল ও আজকের কম্পমান একটি ভিত্তির ওপর-যার নাম বাঙলাদেশ। একাত্তরে শেখ মুজিব ও বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছিলো সমার্থক।

মুজিব যেভাবে আলোড়িত বিস্ফোরিত করে চলেছিলেন বাঙলাদেশকে, হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাসে তা অভুতপুর্ব। ৬৮ থেকে ৭২ - এই পাঁচ বছরে তিনি শুধু আমাদের রাজনীতির প্রধান পুরুষই হয়ে উঠেন নি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় জননেতা, এতোটা জনপ্রিয়তা আর কেউ উপভোগ করেন নি। তাঁর পাশে ভাসানি-সোহরাওয়ার্দি-ফজলুল হক নিম্নমাঝারি, জিয়া হাস্যকর, বাকিরা অত্যন্ত তুচ্ছ। মুজিব শুধু ক্ষমতায় যাবার রাজনীতি করেননি, তিনি রাজনীতি করেছেন যুগান্তর ঘটানোর জন্যে। পাঁচ বছর ধরে শেখ মুজিব শুধু ধ্বংস আর সৃষ্টি করে চলেছিলেন, জ্বেলে দিচ্ছিলেন অব্যয়, অক্ষয়,অবিনাশী বিদ্রোহের আগুন। বাঙালি জাতির বহু শতাব্দীর অগ্নিজ্বলা বিদ্রোহকে শুভানলে পরিণত করেছিলেন মুজিব। একই শুভানলে পুড়ছিলো ঢাকা, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, কুষ্টিয়া; মুজিব, উপকথার যাদুকরের মতো, রচনা করে চলেছিলেন আমাদের মহাকাব্যিক বিজয়গাঁথা। একাত্তরের মার্চেই পাকিস্তান জতুগৃহে পরিণত হয় আর মুজিব পরিণত হন পাকিস্তানের সামন্ত-অধিপতিদের জীবন্ত দুঃস্বপ্নে।

তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত প্রবল কথামালায় বাঙলায় তরুণমাত্রই হয়ে উঠে বিদ্রোহী, নতুন আলো ঢুকে বুড়োদের ময়লাধরা চোখে, শ্রমিকচাষীর পর্যুদস্ত পেশিতেও জাগে শিহরণ। তীব্র প্লাবন দেখা দেয় পাকিস্তানের অধিপতিদের চারপাশে, লাভাস্রোত বয়ে যায় তাদের ওপর দিয়ে। এ সবই করে চলেছিলেন মুজিব। তিনি নতুনভাবে সৃষ্টি করছিলেন ইতিহাস, ক্রমশ পেরিয়ে যাচ্ছিলেন বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমা; এবং হয়ে উঠছিলেন মহৎ।

ক্রমশ পরিস্রুত হয়ে উঠছিলো বাঙালি; হয়ে উঠছিলো তীব্র, সংহত, উদ্বেলিত।

তাঁর স্বদেশকাঁপানো শ্লোগান 'জয় বাঙলা' তখন আলোড়িত ও মুখরিত করে তুলেছিলো আমাদের, এমন সংগীতময় উল্লাসধ্বনি আমরা আগে কখনো শুনি নি। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ততদিনে বাতিল হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে মধ্যযুগীয় সব রূপকপ্রতীক। কর্কশ *পাক সার জমিন সাদ বাদ* - কে পুরোপুরি বাদ দিয়ে তারা বুক ভরে গাইছিলো পৃথিবীর কোমলতম জাতীয়সংগীত - *আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালোবাসি*। দিকে দিকে ছিন্নবস্ত্রের মতো খসে পড়ছিলো চানতারা, পতপত করে উড়ছিলো সবুজের মাঝে সুর্যের মধ্যে বাঙলাদেশের মানচিত্র।

বাঙলি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো স্বাধীনতার আর ধূর্ত পাকিস্তানি অধিপতিদের সাথে আলোচনা করে প্রতারিত হয়ে চলছিলেন শেখ মুজিব। তিনি কি জানতেন না পাকিস্তানি সেনাপতিদের প্রিয় ভাষার নাম রাইফেল আর বেয়নেট; আলোচনায় তৃপ্ত হবার মতো জাতি তারা নয়? চারপাশে তখন কেবল স্বাধীনতা ঘোষনার প্রবল দাবি। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেয়া ছাড়া মুজিবের সামনে কোনো পথ খোলা ছিলো না। মুজিব যদি প্রহসনের আলোচনায় অংশ না নিয়ে পাগল ছাত্রনেতাদের পাগলামোতে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষনা দিয়ে বসতেন, তাহলে তিনি হতেন সামান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী, অথবা বিভ্রান্ত বিপ্লবী; বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি বরণ করতো অথবা আরো বহুকাল প্রলম্বিত হতো।

তবে পাকিস্তানের বর্বর চেঙ্গিশরা থেমে ছিলো না, তারা একরাতেই স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলো পুর্ব বাঙলাকে। তারা লাশ চেয়েছিলো, এবং ভেবেছিলো চীন আমেরিকার অব্যর্থ রাইফেল পাকিস্তানকে টিকিয়ে দেবে কেয়ামত পর্যন্ত আর পাক সার জমিন গীত হবে বাঙলার আলে বিলে পড়ে থাকা সংখ্যাহীন লাশের অস্থিতে। তাই ২৫ শে মার্চ রাতেই তারা পাকিস্তানকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা বন্দী করে শেখ মুজিবকে, তবে তাঁকে বন্দী করে খুব বিপদে পড়ে যায় সেনাপতিরা। ইয়াহিয়ার মাথায় ঘিলু ছিলো কম, সে মনে করেছিলো মুজিবকে খুন করে ফেললেই পূর্ব রণাঙ্গনে পতপত করে চানতারা উড়তে থাকবে। চতুর ভুট্টো অবশ্য বুঝতে পেরেছিলো বন্দী মুজিবের চেয়ে নিহত মুজিব অনেক বেশি অজেয় হয়ে উঠবেন, তাই মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বাঁচিয়ে রেখেই তাঁকে দিয়ে প্রতারণা করাতে হবে বাঙলির সাথে। আমাদের সুখের বিষয় মুজিবকে দিয়ে তারা এর কোনোটিই করতে পারেনি। মুজিব বিক্রি হওয়ার জন্যে জন্ম নেন নি। তিনি আমাদের সাথে প্রতারণা করেন নি।

তবে আমরা অত্যন্ত উদ্যমের সাথে প্রতারণা করে চলেছি নিজেদের।মুজিবের বন্দীত্ব ও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীজীবন যাপনের ঘটনাটি নিয়ে নানা নির্লজ্জ মিথ্যাচার হয়ে আসছে, এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই, মিথ্যা আমাদের মায়ের বুলি। মুজিবের শত্রুর সংখ্যা কখনোই কম ছিলো না, আর এখন তো তারা সংখ্যাহীন। তারা মুজিবের গ্রেফতারবরণের ঘটনাটি নিজেদের স্বার্থে অত্যন্ত অশ্লীলভাবে ব্যাখ্যা

করে। গতো কয়েক দশক ধরে কোটি কোটি তুচ্ছ বামন প্রাণভরে তাঁর নিন্দা করে চলেছে।

যুগে যুগে ইঁদুরছানারা নিন্দা করে সিংহের।

মুজিব যে কাজটি করেছিলেন সেটি ছিলো অভিনব, এবং এক্ষেত্রে তাঁর দুরদর্শীতা প্রশংসনীয়। তিনি যদি পালিয়ে যেতেন, কোনো পাহাড়ের গুহায় বসে ভাঙা বেতারে স্বাধীনতা ঘোষনা করতেন, তাহলে কি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর নামে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো? পড়তো না। সেটি হতো হাস্যকর হঠকারিতা এবং এর পরিনতি হতো মর্মান্তিক। মুজিব পরিণত হতেন সামান্য 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'-তে আর পাকিস্তানের অধিপতিরা পৃথিবীকে বোঝাতো মুজিব একজন সন্ত্রাসী।পুরো ব্যাপারটিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা মনে করে পৃথিবী সাড়া দিতো না আমাদের ডাকে। মুক্তিযুদ্ধ এতো তীব্র হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেতো, এবং আমরা হারাতাম একজন প্রেরণাসঞ্চারী মহানায়ককে।

মুজিব সামান্য ঘোষক ছিলেন না, একাত্তরে তিনি ছিলেন মহানায়ক। হুমায়ুন আজাদকে মনে পড়ছে, তিনি বলতেন, 'ঘোষনা দিয়ে ঘোষক হওয়া যায়, যে কোনো নির্বোধের পক্ষেই তা সম্ভব; তবে ঘোষনা দিয়ে মুজিব হওয়া যায় না। মুজিব হওয়ার জন্যে লাগে দীর্ঘ সাধনা।'

একাত্তরে অনুপস্থিত থেকেও মুজিব, অনেকটা অলৌকিকভাবেই হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির সমস্ত গগনবিদারী শ্লোগান ও অদম্য প্রেরণার উৎস। সব কিছুই পরিচালিত হচ্ছিলো তাঁর নামে। তিনি যখন পাকিস্তানে বন্দী, যখন তিনি মুক্তিযুদ্ধের রূপ সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে , তখনো পুর্ব রনাঙ্গানের প্রতিটি বাঙালি আর মুক্তিযোদ্ধার মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিলো তাঁর নাম। পুরো নয়মাস তিনি নিজেই ছিলেন এক অর্থে মুক্তিযুদ্ধ আর বাঙলার প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষ হয়ে উঠেছিলো একেকটি মুজিব।যোদ্ধা মুজিবের চেয়ে বন্দী মুজিব হয়ে উঠেছিলেন অনেক বেশি শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ক। এমন অভাবিত ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর ঘটেনি। সারা বাঙলাদেশ উদ্বেলিত, উৎকণ্ঠিত ছিলো মুজিবের জন্যে, এতো ভালোবাসা খুব কম নেতার ভাগ্যেই জোটে।

১৯৭১-এ যা কিছু ঘটেছে, মুক্তিযোদ্ধারা যতো পাকিস্তানি জন্তু বধ করেছে, যতো নারী লাঞ্চিত হয়েছে, যতো তরুণ বুকে বুলেট গ্রহণ করেছে, যতো কবি স্বাধীনতার কবিতা লিখেছে, তার সবটাই মুজিবের নামে। অন্য কোনো নামে এতো অসামান্য সাড়া জাগতো না। মুজিব আমাদের পৌছে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে,তিনি সৃষ্টি করেছেন বাঙলাদেশকে। তাঁকে ছাড়া বাঙালি আজো পাকিস্তানি সেনাপতিদের দাসত্ব করতো। অনেক সীমাবদ্ধতা ছিলো মুজিবের; কিন্তু এই সত্য কে অস্বীকার করবে যে তিনিই মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, স্বাধীন বাঙলাদেশের মহাস্থপতি।

আমাদের মিথ্যাচার ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও মুজিববিহীন বাঙলাদেশ স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিলো না। অসংখ্য বাঙালি উৎকণ্ঠিত ছিলো তাদের প্রিয় নেতা কবে ফিরবেন সেই প্রতীক্ষায়। যেনো তিনি কোনো ঐন্দ্রজালিক যাদুকর, আমাদের তিনি যেমন করে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে দুর করবেন আমাদের সমস্ত সংকট। মুজিব ছিলেন আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রে। তাঁর কাছে প্রত্যাশার ও দাবিদাওয়ার কোনো শেষ ছিলো না।

মুজিব যেদিন দেশে ফিরে আসেন, সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে বরণ করতে গিয়েছিলো বিমানবন্দরে। আর গিয়েছিলো সুবিধাভোগী নেতারা, তারা কিলবিল করছিলো মুজিবের আশেপাশে।মুজিব সেদিন থেকেই অপরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন, তাঁর জীবনে শুরু হয় ধারাবাহিক পতন। যে দেশটি তিনি রেখে গিয়েছিলেন, সেই দেশটিকেও যেনো তিনি আর চিনতে পারছিলেন না।

তবে প্রথম বছরেই প্রণীত হয় একটি অসামান্য সংবিধান। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র -এই চারটি মুলভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠত ছিলো সংবিধানটি, যা ছিলো চেতনাগতভাবে আধুনিক ও পাকিস্তানী মধ্যযুগীয়তা থেকে অনেক সুদুর। তবে এই সাফল্য মুজিব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেন নি।

চারিদিকে তখন কেবল অভাব আর অভিযোগ। এরই ফাঁকে একদল দুইহাতে লুণ্ঠন করে চলছিলো দেশটিকে, হঠাৎ করে হয়ে উঠছিলো অসম্ভব ধনী। আরেকদল ছদ্দবিপ্লবী সেজে- চারু মজুমদার, মাও সে তুং আর চে গুয়েভারার মুখোশ পরে, যাকে তাকে খুন করে শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলো। নৃশংস, বীভৎস, অমানবিক খুনোখুনির বিকৃত উল্লাসের মধ্যেই তারা খুঁজে পেয়েছিলো সমাজতন্ত্র। অন্যদিকে মুজিবের ছেলে, ভাগ্নে, চাচা, মামা, ভাই, বোন, ভগ্নিপতিরা মিলে সৃষ্টি করে এক বিশাল রাজবংশ, এবং মেতে উঠে নানা অকাজে। শেখ মনি, যে অবিলম্বে হয়ে উঠে মহাশক্তিমান, তার এবং মুজিববাহিনীর সন্ত্রাসে কেঁপে উঠতে থাকে সারা দেশ। মুজিবের দুই পুত্রও ক্রমশ হয়ে উঠে সন্ত্রাসের যুগলদেবতা, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা মুজিবের সুনাম নষ্ট করতে থাকে।

আর দেখা দেয় স্তাবকেরা, তারা দলে দলে পৌরাণিক ব্রাক্ষনের মতো আবৃত্তি করতে থাকে বাঁধাবুলি-হে বঙ্গবন্ধু, হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙলি, হে জাতির পিতা, ইত্যাদি। মুজিব মহাবিধাতা হয়ে উঠতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন জনগণ থেকে। মুজিব যে বাংলাদেশের স্থপতি হওয়া সত্ত্বেও অবিসংবাদিত মর্যাদা পান নি, এটা তাঁর দুর্ভাগ্য, আর এজন্যে দায়ী তাঁর স্তাবকেরা। মুজিবকে ঐশ্বরিক করতে গিয়ে তারা প্রবল মাতামাতি শুরু করে এবং এককালের জনপ্রিয় মহানায়ককে পরিণত করে জনবিচ্ছিন্ন সামান্য মানুষে।

দেখা দেয় *মুজিববাদ*, যা জন্মলগ্ন থেকেই পরিণত হয় হাস্যকর উপহাসে। মুজিব বিশাল জননেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, তাত্ত্বিক বা মতবাদপ্রবক্তা বুদ্ধিজীবি ছিলেন না, তাঁর ওসব হওয়ার প্রয়োজনও ছিলো না, তাঁর কাছে কেউ রাজনৈতিক দশর্ন বা তত্ত্ব চায়নি। তাঁর আঞ্চলিক উচ্চারণের ‘ভায়েরা আমার’, কিংবা ‘আর দাবায়া রাখতে পারবা না’- কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর কাছে কেউ শুদ্ধ বাঙলা বা ইংরেজি চায়নি, তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তা কোনো মতবাদপ্রবক্তা বা তাত্ত্বিক দিতে পারতেন না। তবে তাঁর স্তাবকেরা মুজিববাদের জন্ম দেয়, যা শুনলে গাধাও হাসতো।

হেন নষ্টামি নেই যা শেখ মনি, সেরনিয়াবাত, শেখ কামাল আর তাদের সাঙ্গাপাঙ্গারা করেনি; রাজনীতি থেকে শুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই তারা দেখাতে থাকে প্রচন্ড মাতবরি, সৃষ্টি করে ত্রাস, আর এই সবকিছুই তারা করে মুজিবের নাম ভাঙিয়ে। ডাকাতি আর নারীহরণকে তো তারা শিল্পে পরিনত করেছিলো, এবং দেশ যখন অনাহারী লাশে ভরে উঠেছিলো তখন মুজিবপুত্রের বিয়েতে রাজমুকুটের খবরটি খুব সুখকর ছিলো না।

ত্রাস সৃষ্টিকারী সংগঠন *মুজিববাহিনী* অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দখল করতে থাকে ঘরবাড়ি এবং পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা বানিজ্য আর অবাধে লুঠ করতে থাকে ধনসম্পদ। তাদের অপকীর্তির

রমরমা সংবাদ পৌছে যায় বাঙলার প্রান্ত থেকে প্রান্তে, আর মুজিব হারাতে থাকেন তাঁর মহিমা। তাঁকে ঘিরে বাঙালির প্রত্যাশার শেষ ছিলোনা, কিন্তু মুজিব ব্যর্থ হন তা পূরণ করতে।

দ্যুতিময় নক্ষত্র হয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ করে পতন ঘটতে থাকে মুজিবের।

মুজিবের ক্ষমতালিপ্সু আত্মীয়বর্গ, জাসদের ভন্ড ছাত্রনেতারা, আর অকস্মাৎ দাঁড়ি-গোঁফ-চুলের জঙ্গাল নিয়ে আবির্ভুত ছদ্দ-বিপ্লবীরা দেশজুড়ে শুরু করে অনন্ত তান্ডব। আওয়ামি লীগের কোন্দলপ্রিয় নেতারা মেতে ওঠে নানা অপকর্মে এবং মুজিব পরিবৃত হোন অসংখ্য নষ্ট নেতাদের দ্বারা। শেখ মনি ও সিরাজুল ইসলাম খানের গুন্ডাপান্ডারা দেশজুড়ে খুনোখুনি শুরু করে, নষ্ট করে অসংখ্য ছাত্রদের, নষ্ট করে মুজিবের ভাবমুর্তি এবং তাদের অনিঃশেষ ভোগলালসা আর মত্ততায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বাঙলাদেশ।

জনগণ দুরে সরে যেতে থাকে মুজিবের থেকে, নাকি বলবো মুজিবই দুরে সরে যান জনগণের থেকে? জনগণ মনে করতে থাকে মুজিবের ছেলে, ভাই, ভগ্নিপতি আর ভাগ্নেদের অপকর্মে প্রশ্রয় রয়েছে মুজিব। শেখ মনির পরামর্শে তিনি অপসারিত করেন মন্ত্রীসভার সবচেয়ে মেধাবী ও সৎ তাজউদ্দিন আহমেদকে; মুজিবের ভাবমুর্তি বলতে আর কিছু থাকে না, তিনি অপ্রিয় হয়ে পড়েন।

১৯৭৩ সালে দেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনটিকে কলঙ্কিত করে তুলে আওয়ামি লীগ। যাকে খুশি পাশ-ফেল করানো হয় এই নির্বাচনে এবং সবই হয় আওয়ামি লীগারদের ইচ্ছায়। মুজিবের মহাকায় মুর্তিটি ততদিনে পরিনত হয়েছে ক্ষুদ্র বামনে। *লালবাহিনী* ও *রক্ষীবাহিনী* তৈরি করেন মুজিব, দুটি বাহিনীই ছিলো অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন আর তাদের হিংস্রতাও ছিলো কিংবদন্তিতুল্য। জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠে আর সশস্ত্রবাহিনী হয়ে উঠে প্রবলভাবে মুজিববিদ্বেষী।

১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুজিব দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষনা করেন। দেশব্যাপী তখন দুটি সশস্ত্র সংঘ মেতে উঠেছিলো লাশের খেলায়। তাদের একটি সর্বহারা বাহিনী আর অন্যটি রক্ষীবাহিনী। সর্বহারা বাহিনীর সুদক্ষ খুনি সিরাজ সিকদার ধরা পড়ে ১৯৭৫ সালের ১লা জানুয়ারি, এবং ২রা জানুয়ারি তাকে হত্যা করা হয়।এই খুনের কলঙ্কে ঢেকে যান মুজিব। ১৯৭৫-এর পঁচিশে মার্চে তিনি জাতীয় সংসদে ‘কোথায় আজ সিরাজ সিকদার’- বলে যে হুংকার দিয়েছিলেন, তা তাঁকে আরো কলঙ্কিত করে।

মুজিবের শোচনীয় মর্মস্পর্শী পতন ঘটে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, ওইদিন চতুর্থ সংশোধনীর নামে তিনি নিহত করেন বাঙলাদেশের সংবিধানকে। মহানেতা, যিনি দশকব্যাপী সংগ্রাম করেছিলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে, তিনিই হত্যা করেন গণতন্ত্রকে, এবং মহানায়ক পরিনত হন মহাএকনায়কে। চতুর্থ সংশোধনী মুজিবকে যতোবার ইচ্ছে ততোবার, চাইলে আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকার ক্ষমতা দান করে।

এতো ক্ষমতা শুধু পতন ডেকে আনে , মুজিব বুঝতে পারছিলেন না তিনি ক্রমশ আত্মহত্যা করে চলেছেন।

গণতন্ত্রকেও বিদায় জানান তিনি, সব দল বিলুপ্ত করে তৈরি করেন *বাকশাল,* যার নাম শুনলে আজো রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। বাকশাল ধ্বংস করে আমাদের বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে, কয়েকটি দাস পত্রিকা রেখে সব পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। বাকশাল নামটি এতোটাই কলঙ্কিত যে এখন আওয়ামি লীগও এই নামটি নেয় না। বাকশাল সৃষ্টি করে মুজিব ধ্বংস করেন তাঁর সমস্ত অর্জন, ধ্বংস করেন নিজেকে ও বাঙলাদেশকে, যে দেশটিকে একদিন তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর আমলে দেশে অনেক ভালো কাজ হয়েছিলো, কিন্তু সেগুলো কেউ মনে রাখেনি, ভালো কাজ মনে রাখা বাঙলির চরিত্রে যদি থাকতো, তাহলে মুজিবকে এভাবে নিহত হতে হতোনা।

১৫ আগষ্ট ঘটে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ও অকল্পনীয় হত্যাকান্ডটি, মাত্র সাতজন ক্ষিপ্ত মেজর ও তাদের কয়েকজন অনুচরেরা মিলে ধানমন্ডিতে যে তান্ডব চালায়, সেই হিংস্রতা ও পাশবিকতার কোনো তুলনা পাইনা আর কোথাও। শিশু থেকে শুরু করে গর্ভবতী নারী পর্যন্ত কাউকে বাঁচতে দেয়নি তারা, খুনে তাদের দক্ষতা ও বীভৎসতা ছিলো অতুলনীয়। বর্বরদের চেয়েও বর্বরতা তারা দেখিয়েছিলো সেই রাতে। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মুজিবের রক্তের ধারাটিকে নিঃশেষ করে দেয়া, এবং লক্ষ্যপূরণে তারা প্রায় সফলও হয়েছিলো। নগরীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে গিয়ে তারা হত্যা করেছিলো মুজিবের আত্মীয়বর্গকে।

ষড়যন্ত্রে মুজিবের ঘাতকেরা ছিলো সুচারু ও সুদক্ষ, দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তারা পরিকল্পনা করেছিলো এই হত্যাকান্ডের, এবং নারকীয় উল্লাসের সাথে তারা বাস্তবায়ন করেছিলো সেটি। দেশকে মুক্তি দেয়ার মহান লক্ষ্য থেকে বা ক্ষমতায় যাবার বাসনায় তারা খুনোখুনি করেনি, তারা যা করেছিলো তার পেছনে ছিলো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা। তবে সবচেয়ে অতুলনীয় ছিলো কৃতঘ্ন আওয়ামি লীগারদের বিশ্বাসঘাতকতা, বাঙালি যে কতোটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে তা প্রমান করার জন্যে তারা উঠেপড়ে লাগে। এক দিনের মধ্যে তাদের একটি বিরাট অংশ দল বেঁধে মোশতাক সরকারে অংশ নেয়।

তখনও মুজিবের রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো সিঁড়ি। যাঁদেরকে তিনি সবচেয়ে কাছের মানুষ বলে মনে করতেন, তাঁরা তাঁকে ও জাতিকে নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা উপহার দেয়। বাঙালির অমানবিকতাকে প্রমান করার জন্যেই যেনো কর্নেল ওসমানি হয়ে উঠেন মোশতাকের প্রধান প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা। মাওলানা ভাসানি মোনাজাত করেন মহান আল্লার কাছে, তবে মুজিবের আত্মার মাগফেরাত চেয়ে নয়, মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে। তবে আল্লা ভাসানির মোনাজাত শোনেননি, মোশতাকের ভন্ডামি মাত্র ৮২ দিন স্থায়ী হয়েছিলো, যদিও তারপরে আমরা আরো অনেক ভন্ডামি দেখেছি এবং আজো দেখে চলেছি।

সবচেয়ে বিশাল যে লাশটি বাঙলাদেশ বয়ে বেড়াচ্ছে তার বুকে, সেটি মুজিবের লাশ। তাঁর এরকম মৃত্যুর কথা ছিলোনা। শত ব্যর্থতার পরও তিনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র মহানায়ক, তাঁকে ছাড়া বাঙলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হতো না, আমরা এখনো দাসত্ব করতাম বর্বর পাকিস্তানিদের। মুজিব আমাদের প্রথম বিজয় এনে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই বিজয় ছিলো আমাদের বিজয়; কিন্তু তিনি নিজেই নিজের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন তারপর, তাঁর সেই পরাজয় আমাদের আজো পরাজিত করে চলেছে, এবং পরাজিত করে চলবে আরো বহুকাল।

———————————————————————————————

১৯ ডিসেম্বর ২০০৬
সিডনি, অস্ট্রেলিয়া